বোমার সঙ্গে বসবাস

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

কথা ছিল গণতন্ত্রের মুক্ত বাতাসে বিকশিত হবে জীবন। থাকবে না কোনো হানাহানি, রাহাজানি। বিদায় নেবে রক্ত আর লাশের রাজনীতি। মানুষ কাজ করবে, ঘুমাবে শান্তিতে...। জনজীবনে ফিরে আসবে স্বস্তি নিরাপত্তা।

স্বৈরশাসনামলে যা মানুষ পায়নি। অনেকরক্ত ত্যাগ আর সংগ্রামের বিনিময়ে পাওয়া গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে কী ঘটছে এসব? স্বাধীন দেশের মানুষের দিন কাটছে গ্রেনেড-বোমার আতঙ্কে। কে কখন, কোথাও আক্রান্ত হবে, কেউ জানে না। কোনো বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণের তদন্ত হচ্ছে না। হচ্ছে তদন্তের নামে রসিকতা। ফলে গ্রেনেড-বোমা বিস্ফোরণ দিন দিন বাড়ছেই। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভয়, আতঙ্ক। ২১ আগস্টের ভয়ঙ্কর গ্রেনেড আক্রমণের পর বদলে গেছে দেশের রাজনৈতিক চিত্র। সর্বত্র অস্থিরতা। রাজনীতিবিদদের বড় একটি অংশ অস্থির, চিন্তিত। বিএনপির অনেক নেতা-মন্ত্রীও চিন্তিত। বোঝা যায় দেশের পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে কেউ কেউ খুশি। তারা আড়ালে আবডালে মুচকি হাসছেন। বিএনপির একটি অংশ, যারা নিজেদের দবি করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে তাদের কোনো তৎপরতা চোখে পড়ছে না। তারা নীরব, নিষ্ক্রিয়...। উল্লসিত মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ গ্রুপ। তারা এখন প্রায় প্রকাশ্যে জামায়াতের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি'র এই অধপতন দেশবাসীকে আরো চিন্তিত করে তুলেছে। মানুষ আশা বা স্বপ্ন দেখার কোনো প্লাটফর্ম খুঁজে পাচ্ছে না।

দেশ যেন ক্রমশ এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের দিকে।

এর মাঝে সক্রিয় হয়ে উঠেছে একদল সুযোগ সন্ধানী মানুষ। যারা বোমা-গ্রেনেড আতঙ্কের থেকে সুবিধা নিতে চায়। পরিকল্পিতভাবে তারা আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। বোমা সদৃশ যেকোনো বস্তু ফেলে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত কোনো কিছুই এই আতঙ্কের বাইরে নয়।

একুশে আগস্ট আওয়ামী লীগ সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর এখন দেশের বিভিন্ন

স্থান থেকে বোমা-গ্রেনেড আবিষ্কারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর মাঝে কিছু সত্যিকারের বোমা-গ্রেনেড বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যগুলো ছিল নিছক ভয় দেখানোর জন্য। সম্প্রতি বোমা বিস্ফোরণ ও গ্রেনেড হামলার জন্য বিখ্যাত সিলেটেই ঘটেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। সিলেট জালালাবাদ সেনানিবাসের কাছে এ বোমা বিস্ফোরণে দু'জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে। বিষয়টা সেখানেই শেষ হয়নি। ঐ বোমা বিস্ফোরণের অকুস্থল থেকে অবিস্ফোরিত কামানের গোলাও পাওয়া গেছে। সিলেটের সর্বশেষ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার পুলিশ বেশ চমক দেখিয়েছে। ঐ ঘটনার বারো ঘন্টার মধ্যেই তারা অকুস্থল থেকে ধরে নেয়া দুই কিশোরের কাছ থেকে জবানবন্দি আদায় করেছে এই বলে যে, তারা সেনা বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে ঐ বোমাটি কুড়িয়ে পায় এবং বিস্ফোরণে নিহত আনোয়ার তাদের কাছ থেকে ঐ বোমাটি কিনে নিয়েছিল ঐ বোমা থেকে সীসা বের করার জন্য। বোমাটি নাকি তারা ভাঙারির দোকানেও দেখিয়েছিল। অবশ্য এর আগে বাড়ির মেয়েরা জানিয়েছিল, আগের রাতে দু'জন যুবক এসে একটা ব্যাগ রেখে যায়। পুলিশ আর সেদিকে এগোয়ানি। আর সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে পাওয়া ঐ বোমা ও কামানের গোলা সম্পর্কে সেনাবাহিনী এখনও মুখ খোলেনি। অথচ এ ধরনের ঘটনায় সেনাবাহিনী আইএসপিআরের মাধ্যমে দ্রুত তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এবার তাদের এই নিরবতা কেন সেটা অবশ্য জানা যায়নি।

সিলেটে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটলেও দেশের অন্যান্য স্থানে বোমা আবিষ্কারের যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তার অধিকাংশই সত্যিকার বোমা নয়। বোমাসদৃশ কিছু রেখে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে ঢাকার উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে বোমা আবিষ্কারের ঘটনা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে কান্নার রোল সৃষ্টি করেছিল। বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী লঞ্চে বোমা পাওয়ার খবরে লঞ্চটি ঘুরিয়ে বরিশালে নেয়া হয় এবং তল্লাশি চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় যে, স্কচটেপ ও তার দিয়ে জড়ানো বস্তুটি আসলে কাদার তাল। এভাবে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও দেশের অন্যান্য স্থান থেকেও এ ধরনের বোমার খবর পাওয়া গেলেও সেগুলো বোমা বলে প্রমাণিত হয়নি। সরকারি মহলের ধারণা যে, দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য এ ধরনের বোমাতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক মহলের ধারণা. ২১ আগস্টের ঘটনা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর জন্য বিশেষ মহল পরিকল্পিতভাবে এই কাজে নেমেছে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার তদন্তকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করাও এর আরেক উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সত্য এটাই যে এখন মানুষ বসবাস করছে বোমার সঙ্গে। বোমা হয়ে পড়েছে মানুষের জীবনের অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের মতো দেশে বিরোধী দলে থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা, অভিযোগ করা যায়। সেটা ঠিক-বেঠিক যাই হোক না কেন। মজার ব্যাপার হলো একই কাজ সরকারি দলও করে। সরকারের কাজ যে অভিযোগ করা নয়, অভিযোগের তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া সেটা আমাদের সরকারগুলো মনে রাখে না। সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীদের দায়-দায়িত্বহীন মন্তব্যে দেশের মানুষ লজ্জা পায়। আবার কিছু কিছু মন্তব্যে তাদের হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পরে। বোমা আতঙ্কে ভীত হয়ে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট, কাউকে কিছু না বলে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব মিডিয়ায় গুরুত্ব দিয়ে এসেছে সংবাদটি। তার এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটাকে আন্তর্জাতিক মিডিয়া বাংলাদেশকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে চরমভাবে। ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের সঙ্গে তুলনা করছে। এই যখন অবস্থা তখন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলছেন, '... এতে বরং আমাদের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।' এমন মন্তব্য দেশের মানুষের শব্দ করে হাসা ছাড়া কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।

সরকার বোমাবাজদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারছে না। উল্টো বলছে পৃথিবীর সব দেশেই বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটছে। কী অদ্ভুত যুক্তি!

মানুষ আপনাদের ক্ষমতায় এনেছেন এই কারণে যে, পূর্বের সরকার যা করেনি আপনারা তা করবেন। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তা না করে সন্ত্রাসের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন। এটা কোন গণতন্ত্রের ভাষা?

বোমা-গ্রেনেড আক্রমণের সঙ্গে নাম আসছে মৌলবাদীদের। এই মৌলবাদী করা? তিন চার বছর আগেও ঢাকার রাজপথে মিছিল হতো, 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' এই শ্লোগান দিতো শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনীরা। তারা প্রাকাশ্যে নিজেদেরকে মৌলবাদী বলে দাবি করতো। এই আমিনীরা এখন বলছে বাংলাদেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা কারা করছে? চেষ্টা যদি কেউ করে থাকে সেটা আপনারা করছেন, অন্যরা নয়। অন্যরা কেউ নিজেদের মৌলবাদী বলে দাবি করছে না। এতোদিন আপনারা মৌলবাদী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। এখন কেন সেই পরিচয় দিতে চাইছেন না? এর সঙ্গে কী বোমা-গ্রেনেড হামলার কোনো সম্পর্ক আছে?

ক্ষমতাসীন জোটের আরেক শরিক দল জামায়াতে ইসলামী। এই দলটির বিরুদ্ধে ধর্মের আড়ালে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, মানুষের রগকাটা, হত্যা করা ইত্যাদি অভিযোগ দীর্ঘকাল ধরে। বর্তমানে যার অনেক কিছু তথ্য প্রমাণ আকারে বেরিয়ে আসছে। চট্টগ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী আহমদ্যা, ভাগিনা রমজানের গোলাম আযম, নিজামীরা কীভাবে সন্ত্রাসী বানিয়েছে, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, মানুষ হত্যা করিয়েছে ধরা পরে সবই বলছে তারা। যার পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আহমদ্যাকে। এসব তথ্য প্রমাণ পাওয়ার পরও সরকার কেন নীরব? মাদ্রাসায় জঙ্গি সন্ত্রাসী ট্রেনিং দেয়ার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে না সরকার? এরাই তো মৌলবাদী। তাহলে সরকার কেন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে?

এসব বোমা আবিষ্কারের পেছনে যে রাজনীতি কাজ করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্রতি সিলেটের ছাতক সীমান্তে বিডিআর কর্তৃক ভারত থেকে আনা বিস্ফোরক ও মাদারীপুরে ২০ হাজার ভারতীয় চকলেট বোমা আটকের ঘটনায়। সরকারি প্রচার মাধ্যমসহ দেশের দক্ষিণপন্থি সংবাদপত্রে এই দুই ঘটনার ব্যাপক প্রচার দেয়া হয়েছে। সিলেটের ছাতক সীমান্তে বোমা বহনকারী আটক ব্যক্তিদের তিন জনের দু'জন ভারতীয়। অন্যদিকে মাদারীপুরের টেকেরহাটের চকলেট বোমার উৎসও ভারত বলে জানা গেছে। সুতরাং এটা ধরে নেয়া যায় যে, সারা দেশে ধারাবাহিক যে বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে সেসব

এই আমিনীরা এখন বলছে বাংলাদেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা চলছে। এতোদিন আপনারা মৌলবাদী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। এখন কেন সেই পরিচয় দিতে চাইছেন না? এর সঙ্গে কী বোমা-গ্রেনেড হামলার কোনো সম্পর্ক আছে?

বোমা-গ্রেনেডের উৎস ভারত বলে সরকার প্রমাণ করতে চায়। অবশ্য ভারতের পক্ষ থেকেও ভিন্ন অভিযোগ আছে। আর সেটা হলো, বাংলাদেশে ভারতের যে বিভিন্ন জঙ্গি গ্রুপ তৎপর রয়েছে তারাই বোমাসহ বিভিন্ন অস্ত্র চালানের সঙ্গে যুক্ত। চট্টগ্রামে যে বিরাট অস্ত্র চালান ধরা পড়ে সেটাও ঐ ভারতীয় জঙ্গিদের জন্য এসেছিল। ঐ জঙ্গিদের সঙ্গে বাংলাদেশের যেসব গোষ্ঠীর যোগসাজশ রয়েছে তারা এ ধরনের বোমা-গ্রেনেডসহ বিভিন্ন অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে যুক্ত থাকতে পারে।

মায়ারা এখনও রয়ে গেছে শেখ হাসিনার সঙ্গে। তারা এখনও শেখ হাসিনার কাছের মানুষ। আবার ক্ষমতায় তারা গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? দেশের মানুষকে এটা বিশ্বাস করতে হবে? আর যাই হোক দেশের মানুষকে এতোটা বোকা ভাবা সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ নয়

এসব বোমা-গ্রেনেডের উৎস যাই হোক, এ নিয়ে যে রাজনীতিই করা হোক দেশের মানুষ এ নিয়ে আতঙ্কিত। তারা ভয়ে কোনো সমালোচনায় যেতে চায় না। এমনকি বিয়ে-শাদী, খেলোধুলার অনুষ্ঠানেও নয়। অর্থাৎ দেশের মানুষের মধ্যে এক চরম নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। এই নিরাপত্তাহীনতা দূর করা সরকারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার ট্রাজিক ঘটনার কোনোটার রহস্যই এ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়নি। এমনকি এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় যাদের বিভিন্ন সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরইবা কি হয়েছে জানা যায়নি। বরং বোমা তৈরি ও সরবরাহ যেন বাংলাদেশের কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের মানুষ সরকার বা পুলিশের কোনো পদক্ষেপের ওপরই ভরসা করতে পারছে না।

একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলা ও পরবর্তী সময় বিভিন্ন বোমা আবিষ্কারের ঘটনার পর পরই সরকারের কিছুটা টনক নড়েছে বলে মনে হয়। এতোদিন এ ধরনের বোমার ঘটনা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে পুলিশের কোনো বিশেষ ইউনিট ছিল না। প্রতি ঘটনায় সেনাবাহিনী বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনতে হতো আবিষ্কৃত বোমা শনাক্ত করতে, সেগুলো নিষ্ক্রিয় করতে। পুলিশের এ ধরনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই তা নয়, পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তার এ বিষয়ে ট্রেনিং আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশের কোনো ইউনিট না থাকায় কাজের সময় ঐসব বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। অনেক পুলিশ অফিসারের এ বিষয়ে ট্রেনিং থাকলেও অন্য কাজে তাদের নিয়োজিত করায় তারা ঐ ট্রেনিং ভুলে গেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশে এ ধরনের বোমা-গ্রেনেড আবিষ্কার ও বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয় মোকাবেলার জন্য পুলিশের বোমা বিশেষজ্ঞ দল বা ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পুলিশের দক্ষ অফিসারদের নিয়ে এই ইউনিট গঠিত হবে। এই ইউনিটকে সামরিক বাহিনীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বোমা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কীটস্‌ও সরবরাহ করা হবে এদের। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বোমাতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে রেডিও-টিভির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে জনমনে আস্থাবোধ ফিরে আসবে।

তবে যে ব্যবস্থাই নেয়া হোক না কেন এসব বোমাবাজির ঘটনার পেছনে কোন শক্তি কাজ করছে তা খুঁজে বের না করা হলে কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ ধরনের বোমাবাজির নানা ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে কোনো না কোনো সংগঠন তার দায়িত্ব স্বীকার করে। কিন্তু বাংলাদেশের এ ধরনের ঘটনার দায়িত্ব এ যাবৎ কেউ স্বীকার করেনি। সরকারি তদন্তেও এসব ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়নি। এসব ঘটনার পেছনে ক্রিয়াশীল সংগঠন বা শক্তিকে চিহ্নিত করতে না পারলে এ ধরনের বোমাবাজির ঘটনা ঘটতেই থাকবে। জনমনে যে বোমাতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেবল কথা দিয়ে দূর করা যাবে না। দেশে এই ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ, গ্রেনেড হামলা, বোমা আবিষ্কারের ঘটনার প্রেক্ষিতে জনমনে আস্থাবোধ ফিরিয়ে আনতে এই কাজটি করতে হবে সবচেয়ে আগে।

ধর্মের নামে একদল উন্মাদের আস্ফালন চলতেই থাকবে, একটা গণতান্ত্রিক দেশে সেটা কারো কাম্য হতে পারে না। বিএনপির নিজের টিকে থাকার স্বার্থেই, এই ধর্মব্যবসায়ী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। অন্তত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

এখনকার বিরোধী দল আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থেকে যে ভুল করেছিল, তার মূল্য এখন তাদের দিতে হচ্ছে। তারা যদি তাদের সময়ে ঘটা বোমা বিস্ফোরণগুলোর তদন্ত করতো তাহলে হয়তো ২১ আগস্ট তাদের আক্রান্ত হতে হতোনা। এখন আক্রান্ত হয়ে বিরোধী দলে থেকে তারা কী দাবি করছে দেশের মানুষ সেটা বুঝতে পারছে না। আন্তর্জাতিক তদন্ত বলে তারা কী বোঝাতে চাইছে সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না মানুষের কাছে। কোনো তদন্ত মানি না- সেটারও ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ২১ আগস্টের ঘটনার তদন্তের দাবি আর ক্ষমতায় যাওয়া দুটি ভিন্ন বিষয়। এটা মাথায় রাখতে হবে আওয়ামী লীগসহ সবগুলো বিরোধী দলের। আজ দেশের মানুষ কেন বিএনপির পতন ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনবে? বিএনপি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, বোমা-গ্রেনেড আক্রমণের তদন্ত করছে না, এই কারণে? মানুষ কেন বিশ্বাস করবে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে এই কাজগুলো করবে? আওয়ামী লীগের সময়ে দোর্দন্ড প্রতাপের সঙ্গে যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হাজারী, তাহের, শামীম ওসমান, হাজী সেলিম, মায়া, আবুল হাসানাত...। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু মায়ারা এখনও রয়ে গেছে শেখ হাসিনার সঙ্গে। তারা এখনও শেখ হাসিনার কাছের মানুষ। আবার ক্ষমতায় তারা গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? দেশের মানুষকে এটা বিশ্বাস করতে হবে? আর যাই হোক দেশের মানুষকে এতোটা বোকা ভাবা সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিএনপি-আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার সাপলুডু খেলার গুটি জনগণ। জনগণ তাদের কাছে গিনিপিক। তারা ভয়ে থাকলো না আতঙ্কে থাকলো এটা নিয়ে তাদের কিছু যায় আসে না। বিএনপি রাজনীতি করছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। আওয়ামী লীগ রাজনীতি করছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। তাদের এজেন্ডায় জনস্বার্থ নেই।

বিএনপি ক্ষমতায় থেকে ধরেই নিয়েছে আগামী নির্বাচনেও তারাই বিজয়ী হবে। এ কারণে জামায়াতসহ মৌলবাদীদের অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে না।

এখানে আবারও স্মরণ করছি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সেই দানবের কথা। মৌলবাদীরা ক্রমেই হয়ে উঠেছে সেই দানব। যে দানব হত্যা করবে তার স্রষ্টাকে। দানবের স্রষ্টা বিএনপি সেটা না বুঝলেও জনগণ ঠিকই বুঝতে পারছে।